একক ৩ ❐ পরিকল্পনা এবং ভারতীয় অর্থনীতি

গঠন

৩.১ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৩.২ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিতা

৩.৩ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

৩.৪ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের মূল্যায়ন

৩.৪.১ পরিকল্পনাকারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

৩.৪.২ পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের মূল্যায়ন

৩.৪.৩ পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াসের মূল্যায়ন

৩.৪.৪ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মূল্যায়ন

৩.৫ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোনো সক্রিয় উদ্যোগ ছিল না। তাছাড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারনা ১৯২০ সা পর্যন্ত ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অগ্রণী প্রবক্তাগণ (যেমন, দাদাভাই নওরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে) দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; কিন্তু তখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কোনো দেশেই ছিল না—ভারতেও ছিল না।

১৯২৪ সালে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে ডঃ এম. বিশ্বেশ্বরায়া তাঁর সভাপতির ভাষণে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিশ্বেশ্বরায়ার দুটি উল্লেখযোগ্য বই হল Reconstructing India এবং Planned Economy for India। ত্রিশের দশকে তিনি এই বই দুটো লিখেছিলেন। তবে এম. বিশ্বেশ্বরায়া ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকল্প পরিকল্পনার (Project planning) উপর আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি দিয়েছিলেন, যদিও একটি সার্বিক জাতীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছিলেন।

ত্রিশের দশকে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে প্রধান প্রবক্তা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৮ সালে Independence League of India-র বাংলা শাখার ইস্তাহারে সুভাষচন্দ্র মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ এবং রেল, জাহাজ ও বিমান পরিবহনের জাতীয়করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৩৩ সালে লন্ডনে রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রেরিত সভাপতির ভাষণে স্পষ্টই বললেন—ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন করতে হবে বৈজ্ঞানিক পথে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এগিয়ে এসেছিলেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমর্থনে। ১৯৩৫-১৯৩৯ সালে Science and Culture পত্রিকায় মেঘনাদ সাহা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমর্থনে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৯৩৭ সালে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ "Indian National Reconstruction and Soviet Example" সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাভাবনা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) সভাপতির ভাষণে। তাছাড়া ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনে দেওয়া (Indian Science News Association) ভাষণ (১১ আগষ্ট, ১৯৩৮), প্রাদেশিক কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রিদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ (২রা অক্টোবর, ১৯৩৮) এবং নিখিল ভারত প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধনী ভাষণে (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮) সুভাষচন্দ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষির উন্নয়ন নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রের মালিকানায় ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা অপরিহার্য হবে। "পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সমগ্র কৃষি ও শিল্পব্যবস্থাকে ক্রমশ সামাজিকীকরণের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।"

ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় প্রদত্ত ভাষণে সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনার নিয়ামক নীতি নির্ধারণের কথা বলেছিলেন। জাতীয় স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে মূল শিল্পগুলির যথা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, যানবাহন ও যোগাযোগ বস্তু নির্মাণ প্রভৃতির বিকাশ সাধন পরিকল্পনার নিয়ামক নীতির অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসী

শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন ভারতের প্রয়োজন হল একটি শিল্প বিপ্লব, ইংলণ্ডের মতো নয়, রাশিয়ার মতো।

১৯৩৮ সালে ভারতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির গঠন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (National Planning Committee) সভাপতি। নিখিলভারত প্ল্যানিং কমিটি (All-India Planning Committee) হিসাবেও এটা পরিচিত ছিল। ১৯৩৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর এই কমিটির উদ্বোধন করেন সুভাষচন্দ্র। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি শিল্পের স্থান নির্ণয় (Location of Industry), শিল্প সংগঠন, শিল্প পরিচালনা ও তার আর্থিক নীতি তৈরি করবে তখন এটাই আশা করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ছাড়া বোম্বাইয়ের আটজন শিল্পপতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এটাকে বলা হল "বোম্বাই পরিকল্পনা" (Bombay Plan)। শ্রী এম. এন. রায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি 'জনগণের পরিকল্পনা' (People's Plan) তৈরি করেন। তাছাড়া শ্রীমন নারায়ণ এবং পরবর্তীকালে শ্রী এস. এন. আগরওয়ালা "গান্ধী পরিকল্পনা" (Gandhian Plan) নামে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশেষ নেই।

এই প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিকল্পনার যৌক্তিকতা নিয়ে সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। গান্ধীজী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব কখনই মেনে নেননি। গান্ধীজীকে আশ্বস্ত করার জন্য সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলাল নেহেরু উভয়েই ঘোষণা করেছিলেন যে বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন হবে বলে পরিকল্পনায় কুটির শিল্পকে উপেক্ষা করা হবে না। কুটির শিল্প যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গুরুভার শিল্পের উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি প্রভৃতিকে পরিকল্পনার কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী চেয়েছিলেন গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় বৃহদায়তন শিল্প ও কুটির শিল্পের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। একটি অপরটির পরিপূরক হতে পারে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে কৃষিকে বাদ দিয়ে ভারতে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হতে পারে না। জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার, সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রভৃতির উপরও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে বারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। শ্রী ভি. ভি. গিরি, শ্রী হরিবিষ্ণু বাসাথ প্রভৃতি নেতারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর জীবদ্দশায় নিজেকে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে তৈরি করতে পারেননি। তারণ তাঁর উপর ছিল গান্ধীজীর বিরাট প্রভাব। সেজন্য রওহরলাল নেহরু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কর্মসূচী কংগ্রেস শাসিত প্রাদেশিক সরকারগুলিতে ঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারেননি। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূচনা হয় জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। স্বাধীন ভারতে নেহরুকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান স্থপতি হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিস মাসে (তখন গান্ধীজী প্রয়াত হয়েছেন) ঘোষিত ভারতের শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) কথা বলা হয়। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী বারতের সংবিধান গৃহীত হয়; তাতেই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশক (Directive Principles of State Policy) সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে ভারতের আর্থ-সামাজিক বিকাশের লক্ষ্য কী হবে তা বলা হয়। জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতের প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (National Planning Commission) গঠিত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এই পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৫৫-৫৬ সা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৫৭—১৯৬০-৬১) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের (Socialist Pattern of Society) কথা বলা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও নিজস্ব কর্বসূচীতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ২৫ শতাংশ জাতীয় ায় বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ এবং আয় ও ধনের বৈষম্য কমাবার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাটি বহুলাংশে প্রশান্ত মহলানবীশ প্রদত্ত মডেল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মহলানবীশ মডেলে একদিকে গুরুভার ও মৌলিক শিল্প এবং অপরদিকে ভোগ্য সামগ্রী শিল্পের উৎপাদন বাড়াবার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। জওহরলাল নেহরু একদিকে মহলানবীশ মডে এবং অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা—এই দুটোর উপর নির্ভর করেই দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়িত করার চেষ্টা করেচিলেন। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন, বিশেষ করেখাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে অগ্রাদিখার দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং তাদের সামনে আরও উন্নত ধরনের এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সম্ভবনা উন্মুক্ত করার কথা বা হয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অগ্রাদিখার দেওয়া হছেিল জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি এবং গুরুভার ও মৌলিক শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের প্রতি। এই দুটো পরিকল্পনাতেই অসম-উন্নয়ন বা অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন পদ্ধতি (Technique of Unbalanced Growth) প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার

চূড়ান্ত পর্যায়ে যাতে সুষম উন্নয়ন (Balanced Growth) বর্জন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যায় সে চেষ্টা করা হয়েছিল।

জওহরলাল নেহরুর আমলে তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। এই তিনটি পরিকল্পনাকালে সরকারি ক্ষেত্রের (Public Sector) দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছিল, এবং মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই শিলোপন্নয়নের প্রসাস চলছিল।

নেহরু-মহলানবীশ পরিকল্পনা মডেল যদিও দেশকে শিল্পোন্নয়নের পথে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তবুও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রা সংকট চীব্র হয়েছিল। দেশের প্রকৃত সম্পদ (real resources) কতটা ছিল, বিদেশ থেকে মূলধনী দ্রব্য আমদানি করার ক্ষমতা কতটা চিল এবং কতটা বাজেট ঘাটতি করা যুক্তিযুক্ত ছিল—এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসঙ্গতি থাকায় দেশের অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। অনেকে একটা ''উচ্চকাঙ্খার সংকট'' (crisis of ambition) বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংকটো তীব্রতা কমানো সম্ভব হয়েছিল। নেহরুর আমলে আমদানির বিকল্পীকরণ (Import substitution) নীতি গৃহীত হয়েছিল। আমদানির উপর অধিক হারে শুল্ক ধার্য করে এবং আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে যাতে আমদানির বিকল্প দ্রব্য দেশেই উৎপাদন করা যায় সেই চেষ্টা চালানো হয়েছিল। এই নীতির পক্ষে যুক্তি ছিল, বেশি হারে আমানি শুল্ক ধার্য করা হলে রাজস্ব বাড়বে, আমদানির পরিমাণ কমবে এবং তার একটি অনুকূল প্রভাব হবে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি মেটাবার ক্ষেত্রে, দেশীয় শিল্পগুলি আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহী হবে এবং যদি এর ফলে বিকল্প দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে তবে কর্মসংস্থানেরও সম্প্রসারণ হবে। বলা বাহুস্য, এই নীতিতে রপ্তানি বাড়াবার প্রয়োজন থেকে আমদানি কমাবার প্রয়োজনের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এজন্য এটাকে বলা হত ''হতাশাব্যঞ্জক রপ্তানি'' (Export Pessimism)। ষাটের দশকেও এই নীতি কার্যকর ছিল। সত্তরের দশক থেকে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বুঝতে থাকেন যে আমদানি নিয়ন্ত্রণ নয়—রপ্তানি উন্নয়নই (Export Promotion) হল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সংকট দূর করার উপায় এবং রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মূলধৰ সামগ্রী আমদানির খুবই প্রয়েজন।

আগেই বা হয়েছে, জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুগামী ছিলেন। সেই চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ১৯৬০ সালে দেশে আয়ের বন্টন ও জীবনধারনের মানে যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য প্রশান্ত মহলানবীশের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি তাঁদের প্রতিবেদন দাখিল করেন ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষে। এই কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের

এক বছর বাদেই (১৯৬৪) গঠিত হয় একচেটিয়া ক্ষমতা তদন্ত কমিশন (Monopolies Inquiry Commission)।

জওহরলাল নেহরু প্রয়াত হাবার পর শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আদর্শ সামনে রেখে পরিকল্পনার নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে দেশের ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং ১৯৮০ সালে আরও ছয়টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল, এবং দেশ ক্রমশ আমদানি বিকল্পীকরণ নীতি থেকে রপ্তানি উন্নয়ন নীতির দিকে সরে আসছিল। ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই দারিদ্র দূরীকরণ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয়।

ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবার পর চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫) পর পর দু'বছর প্রচণ্ড খরা, টাকার মূল্যহ্রাস (১৯৬৬) এবং প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফতী ও রাজকোষের তীব্র ঘাটতি—এই কারণগুলির জন্য পাঁচ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা তখন সম্ভব ছিল না। এজন্য ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ এই নি বছরের জন্য তিনটি আলাদা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করাযেতে পারে যে এই সময় থেকে নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের সুফল পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকেই দেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। যে সবুজ বিপ্লবের সূচনা তখন হয়েছিল সেটি নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেও অব্যাহত আছে।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত। উন্নয়নের গতি বাড়ানো এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা ছিল চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। ইন্দিরা গান্ধী দেশ থেকে দারিদ্র্য হটাবার শ্লোগান দিয়েছিলেন। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষেও দেশে ২৫ শতাংশেরও বেশি লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে আছে বলে অনুমিত হয়েছে।

১৯৭৪-৭৫ সালে পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হবারআগেই ১৯৭৭-৭৮ সালে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারেরও পরিবর্তন হয়। জনতা দলর নতুন সরকার (মোরারজী দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে) দেশে Rolling Plan চালু করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছিল। ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনা দুবার রচিত হয়েছিল। ১৯৮০-৮৫ সালের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল ১৯৭৮-৭৯ সালে। কিন্তু জনতা দলের

সরকার সেই পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিলেন। পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আবার সরকার গঠন করলে ১৯৮১ সালে নতুন করে ষষ্ঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল; কিন্তু খাতায় কলমে ১৯৮০ সাল থেকেই ষষ্ঠ পরিকল্পনা কার্যকর হয়। এই পরিকল্পনাটিও দারিদ্র্য হটানোর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) ছিল রাজীব গান্ধীর আমলে তৈরি। রাজীব গান্ধী নতুন প্রযুক্তির দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালেই অমদানি উদারীকরণের নীতি প্রথম অনুসৃত হয়, যিদও তারগণ্ডী ছিল সীমিত। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় একদিকে কোষাগার ঘাটতির (Fiscal Deficit) ক্রমবৃদ্ধি এবং অপরদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি ও বৈদেশিক ঋণের বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক সংকটের সূচনা করে। তবে সপ্তম পরিকল্পনায় গড় উন্নয়ন হার ছিল ৫.৯ শতাংশ। অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে ১৯৯০-৯১ সালে। ১৯৯১ সালে নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী এবং মনমোহন সিং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হবারপর দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী গৃহীত হয়।

ভারতে অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গৃহীত হবার পূ পূর্ববর্তী পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মসূচী তেকে দেশের অর্থনীতি অনেক সরে আসে। সারা বিশ্বে বাজার-অর্থনীতির ঢেউ এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের শর্তাবলর পূরণ করার বাধ্যবাধকতা ভারতকে অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেঙগ অর্থনৈতিক উদারীকরণ (Economic Liberalisation), বেসরকারীকরণ (Privatisation) এবং বিহ্বায়ন (Globalisation)—এই তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখে অর্থলনতিক সংস্কারের কর্মসূচী এবং দেশের অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিভানের কর্মসূচী (Structural Adjustment Programme) গৃহীত হয়। তার ফলে যে অর্থনৈকি পরিকল্পনাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হত, সেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে দেশের অর্থনীতি অনেকটাই সরে আসে। তবে এর মধ্যেই নব্বইয়ের দশকে অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে উল্লখ করা যেতে পারে, সপ্তম পরিকল্পনার মেয়াদ আগে শেষ করে দিয়ে আবার দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৯২-৯৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বা গতি প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দেশে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখই দেশে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা (Democratic Planning) প্রবর্তিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় মিশ্র-অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে বেসরকারী ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ভারতে যে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তি হয়েছে তাতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি উদ্যোগের ভূমিকা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে এবং বেসরকারী

ক্ষেত্রে ভূমিকা ক্রমেই সক্রিয় হচ্ছে। অষ্টম ও নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বেসরকারি ক্ষেত্রের ভঊমিকা পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলি অপেক্ষা অনেক বেশি প্রতিভাত হয়েছেঙ

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতে পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণও (Decentralisation) শুরু হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ব্লক পর্যায়, মহকুমা পর্যায় এবং জেলা পযায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে রাজ্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন রাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

৩.২ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা

যে কোনো অনগ্রসর দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। অনগ্রসর দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত অনুন্নত থাকে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারও কম থাকে। এসব দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারও খুব কম থাকে। থাড়া আয় ও ধনের বৈষম্য, তীব্র দারিদ্র, বেকার সমস্যা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি অনগ্রসর দেশের বৈশিষ্ট্য। উন্নতিকামী দেশগুলির এই ত্রুতিট-বিচ্যুতিগুলি দূর করার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতির পক্ষে দ্রুত জাতীয় আয় বাড়ানো সম্ভব নয়। সীমিত আর্থিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উৎপাদন বাড়াতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে আয় ধনের বৈসম্য বেড়ে যায় এবং দেশগুলি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত উন্নতির পথে এগোবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে রাশিয়ার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯১৭ সালের অবব্যহিত পরে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভারতের মতো। বরং তখন রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান চিল এবং দেশে বড় বড় জোতদার (kulaks) ছিল। রাশিয়া তখন শিল্পোন্নত ছিল না। কৃষিক্ষেত্রে দেশটি অনগ্রসর ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই সেই দেশের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল। তখনকার রাশিয়া (পূর্বতন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র) অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল।

উন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান নূর করার জনয তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই অথনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয়েছে। (১) জাতীয় আয়ের বদ্ধি, (২) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, (৩) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, (৩) জাতীয় উৎপাদনের সুষ্ঠু বন্টন, (৫) মূলধন সৃষ্টির হার বাড়ানো, (৬) কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ, (৭) বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন এবং (৮) সামাজিক ন্যায়

প্রতিষ্ঠার জন্য ও দেশ থেকে দারিদ্র দূর করার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খুবই প্রয়োজন। পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতিতে এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা সম্ভব নয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবে দেশে উৎপাদনের উপকরণগুলির অপচয় বেশি হয় এবং তার ফলে দেশের আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। শিল্প-উৎপাদন এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার অভাব দূর করার জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিতে জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বেড়ে যেতে পারে, আবার সেই সঙ্গে বেকার সমস্যার তীব্রতা এবং ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দাও বেড়ে যেতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দূর করা এবং বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত, সেগুলি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেজন্য সে সব দেশের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেশি হলেও বর্ধিত আয়ের সুফল জনসাধারণের মধ্যে সমানভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টিত হয় না। সেজন্য এইসব দেশে বড়লোকের পাশাপাশি বহু গরীব লোক থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে বেকার সমস্যার তীব্রতা এবং জনসাধারণের মধ্যে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বেকার সমস্যার তীব্রতা কমাতে পেরেছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনও করতে পেরেছিল। এখানেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা প্রতিভাত হয়।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে এটাও বলা যায় যে পুরোপুরি বাজার-অর্থনীতি ব্যবস্থায় ভারতের পক্ষে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বাজার-অর্থনীতিতে যে কোনও ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব থাকতে পারে। কোনও দ্রব্যের জন্য (যেমন খাদ্যশস্য অথবা শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল) চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা বেশি হয় তবে সেই ক্ষেত্রে যোগান বাড়াবার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ খুবই জরুরী। আবার জনসাধারণের অতিরিক্ত চাহিদা ও ক্রয়শক্তির দরুন যদি মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় তবে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়। শুধু বাজারে চাহিদা ও যোগানের স্বাধীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হাতে গোটা অর্থনীতিকে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্তি নয়। এজন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন খুবই বেশি। স্বল্পোন্নত দেশে আর্থিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকে। বেসরকারি ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিনিয়োগও অর্থের অভাবে আটকে যেতে পারে। তাছাড়া আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারসাম্যের অভাবে দেশে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট হতে পারে ও বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা যেতে পারে। এই সমস্যাগুলির প্রতিকার করার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ খুবই জরুরী এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই রাষ্ট্র এক্ষেত্রে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। এজন্য ভারতের মতো দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা খুব বেশি।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা খুব বেশি থাকা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন ভারত পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে দূরে সরে আসছে এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণের (Economic Liberalisation) পথ বেছে নিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে ভারতে ১৯৯০-৯১ সালের তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে—যে সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ভারতকে অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী (Package of Economic Reforms) গঠন করতে হয়। ১৯৯০-৯১ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে তীব্র ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের সংকট প্রতিফলিত হয়েছিল দেশের ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণে। ১৯৯১ সালের জুন মাসে ভারতীয় মুদ্রায় দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১,২০,০০০ কোটি টাকা। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (Gross Domestic Product) এটা ছিল প্রায় ৩৩ শতাংশ। অপরদিকে সরকারের কোষাগার ঘাটতির (Fiscal Deficit) পরিমাণও অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল এবং এটা ছিল দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) প্রায় ৮.৫ শতাংশের মতো। ১৯৯১ সালের গোড়ায় ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১২ শতাংশ। দেশের অভ্যন্তরে শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতা এবং শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার হ্রাস, এবং বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হারে অবমূল্যায়ন—প্রভৃতি কারণে ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার খুব জরুরী বলে বিবেচিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা সংকট থেকে উদ্ধার পেতে ভারতকে প্রচুর বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয়, এবং এই ঋণের বেশির ভাগ নেওয়া হয় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) থেকে। তাছাড়া দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত সামঞ্জস্য (Structural Adjustment) বিধানের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকেও প্রচুর ঋণ গ্রহণ করতে হয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণের শর্ত হল দেশকে অভ্যন্তরীণ সরকারি ব্যয়ের চাপ কমিয়ে অতিরিক্ত চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত (demand management) রাখতে হবে এবং ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস ঘটিয়ে বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের শর্ত হল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ (Privatisation), উদারীকরণ (Liberalisation) এবং বিশ্বায়ন (Globalisation) সুনিশ্চিত করতে হবে।

ভারতকে এই শর্তগুলি পালন করার জন্য একগুচ্ছ অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী (Package of Economic Reforms) গ্রহণ করতে হয়েছে, এবং তার ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে অনেকটা সরে আসতে হয়েছে।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সারা বিশ্বে বাজারে অর্থনীতির দিকে একটি ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation) গঠিত হবার পর বহুপাক্ষিক বাণিজ্য এবং সেই বাণিজ্যের বিশ্বায়ন (Globalisation) দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের পক্ষেও এই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা এজন্য ক্ষুন্ন হয়নি। সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন, বিশেষ করে শিক্ষার সম্প্রসারণ, জনস্বাস্থ্যের সুবিধা সম্প্রসারণ ও তার মান উন্নয়ন, ময়লা সাফাই ব্যবস্থা, দূর গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সরবরাহ, কৃষির উন্নয়ন, বিশেষ করে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জনসাধারণের জন্য খাদ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো (Economic Infrastructure) উন্নয়নের জন্য ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা এখনও অপরিসীম।

৩.৩ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা আরও বেশী অনুভূত হয়। কারণ পরিকল্পত অর্থনীতি ছাড়া এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা অসম্ভব। ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

১) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং তাদের সামনে আরও উন্নত ধরনের এবং বৈচিত্র্যপুর্ণ জীবনের সম্ভবনা উন্মুক্ত করা।

ভারতের প্রথম পাঁসালা পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে অনুযায়ী মানবীয় এবং বস্তুগত সব সম্পদের সদ্ব্যবহার করে উফকাদন বাড়ানো এবং পরবর্তীকালে আয়, ধন ও সুযোগের বৈষম্য কামানোর কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। প্রথম পাঁচসালা পরিপল্পনায় যুদ্ধোত্তর ভারত এবং দেশ-বিভাগজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপর এবং খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা সহজ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দেশের উন্নয়ন কর্মসূচী প্রসতুত করে এবং সেগুলি ঠিকভাবে কার্যকর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভবিষ্যতের জন্য সুদৃঢ় করার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সংগঠন উন্নত করার উপরেও প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(২) জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা।

যে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনারই প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান লক্ষণ প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি। স্থির মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বাৎসরিক ৩.৭ শতাংশ এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বাৎসরিক ৪.২ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বেড়েছিল। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হারে ছিল ৫.৯ শতাংশ এবং অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সেই হার ছিল ৬.৭ শতাংশ।

(৩) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি পরিকল্পত বিনিয়োগ হার বর্জন করা।

পরিকল্পিত বিনিয়োগ হার অর্জন করতে পারলে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনী শক্তি বাড়ে এবং তার সাহায্যে পরিকল্পিত হারে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। তাছাড়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পিত হারে বিনিয়োগ বাড়ালে পরিকল্পনার শেষে দেশের মূলধন সরবরাহের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং যার ফলে ভবিষ্যতের উৎপাদনী শক্তি বাড়ানো সম্ভব হয়। ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনা পর্যন্ত ভারতে কোনও পাঁচসালা পরিকল্পনাতেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিকল্পিত বিনিয়োগ হার অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বাজার দরে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনরে (GDP) ২২.৭ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। অষ্টম পাঁচসাা পরিকল্পনায় বাজার দরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনরে ২৪.৯ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার বাজার দরে বিনিয়োগ হার বেশি হলেও প্রকৃত আয়ের (Real Income) ভিত্তিতে বিনিয়োগ হার তার চেয়ে কম ছিল। নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার বাজার দরের ভিত্তিতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২৮.২ শতাংশ বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।

(৪) আয় ও ধনের বৈষম্য এবং সম্পদের উপর অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীকরণ হ্রাস করা যাতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত হতে পারে, এবং দেশ তেকে দারিদ্র্য দূর করা যেতে পারে।

যদি আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আয় এবং ধনের বৈষম্য হ্রাস করা, তবুও আয় এবং ধরেন পুনর্বন্টন করার জন্য এখন পযন্ত অভাবনীয় কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলা চলে না। তবে শিল্প লাইসেন্স প্রদানে কড়াকড়ি করা, অপেক্ষাকৃত ধীন শ্রেণীর উপর বেশি হারে করা ধার্য করা, জোতের আয়তনের উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপ করা, প্রভৃতি ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং শহর-অঞ্চলের সম্পত্তির উপর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন ধনী-শ্রেণীর উপর বেশি করে কর ধার্য করে গরিব-শ্রেণীর জন্য তা খরচ করলে আয় ও ধনের বৈষম্য কমানো সম্ভব হবে। বাণিজ্যিক ব্যাংক, জীবনবীমা কোম্পানি, সাধারণ বীমা কোম্পানি, কয়লাখনি, প্রভৃতি জাতীয়করণ এবং সরকারী সংস্থা গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে বৃহৎ শিল্প-গোষ্ঠীর হাতে অর্থনৈতিক শকিত কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় আয় ও ধনের বৈষম্য হ্রাস করাএবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া বন্ধ করা অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় থেকেই আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং আয়ের বৈষম্যই দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। সেজন্য পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় আয় ধনের বৈষম্য হ্রাস করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ষষ্ঠ

পাঁচসালা পরিকল্পনারও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা। সপ্তম অষ্টম এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও এই উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

সরকারের লক্ষ্য ছিল ২০০০ সালের মধ্যে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। একটি সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৯৭-৯৮ সালে অর্থাৎ, নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বছর ভারতের টোম জনসংখ্যার ৩৫.৯৭ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল। ২০০০ সালের শেষে এই অনুপাত কিছুটা করেছে বটে, —কিন্তু দারিদ্র্য নিমূল করার মতো অবস্থা ভারতে এখনও তৈরি হয়নি।

(৫) অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ভারতের লক্ষ লক্ষ কর্মহীন লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে প্রতিটি পরিকল্পনারই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বেকার সমস্যার তীব্রতা কমানো এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বেকার সমস্যার তীব্রতা কমানোর জন্য গ্রামাঞ্চলের জন্য এবং শহরাঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা বেশ কয়েকটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। স্ব-নিয়োজিত কাজের সুযোগ বাড়াবার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়াস চালাচ্ছেন। কিন্তু অতিরক্তি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। বরৎ সংগঠিত ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা অবসর নীতি (Voluntary Retirement Scheme) চালু হওয়ায় এবং বহু রুগ্ন শিল্প ও কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংগঠিত ক্ষেত্রে বেকার সমস্যাকে নূতন মাত্রা দিয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও স্বনিয়োজিত কাজের সুযোগ আশানুরূপ বাড়ছে না। বেকার সমস্যাই দেশের দারিদ্র্যের মূল কারণ।

(৬) ভারতের অথনৈতিক পরিকল্পনার তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে যথা—কৃষি উৎপাদন, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষমতা এবং বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমুদয় প্রতিবন্ধক ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য ব্যবস্থা অবম্বন করা।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা র্জন এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বদ্ধি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রে পর আপেক্ষিকভাবে কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রের উপর সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কৃষিট-উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার শোচনীয় ব্যর্থতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় নতুন কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতি (New Agriculture Strategy) কার্যকর হয়।

পরবর্তীকালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ''সবুজ বিপ্লবের'' সৃষ্টি হয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়লেও আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধক এখনও আছে। জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা, দূর গ্রামাঞ্চলে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা এবং সময় মতো যাতে জলসেচ করা হয় তার ব্যবস্থা করা এবং গরীব কৃসকরা যাতে উচ্চফলনশীল বীজ কিনতে এবং সার ও কীটনাশক ওষুধ কিনতে সমর্থ হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা, —এই প্রয়োজনগুলি ঠিকভাবে মেটাতে না পারলে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষি-উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না। কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকগুলি দূর করে কৃষি উৎপাদনরে হার বৃদ্ধি করা আমাদের অর্থনৈতিক পকিল্পনার অন্যতম উদেদশ্য। শিল্প উৎপাদনরে ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে কোনো কোনো শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদনয় শক্তির সদ্ব্যবহারের অভাব, কেনো কোনো শিল্পে উৎপাদনী শক্তির স্বল্পতা, কাঁচামালের উপযুক্ত সরবারাহের অভাব, কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরতা, উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের অভাবহেতু কোনো কোনো শিল্পজাত সামগ্রীর ক্ষেত্রে বাজারের বিস্তৃতি না হওয়া, বহুক্ষেত্রে উপযুক্ত শিল্প-মূলধনের অভাব, শ্রমি-মালিক বিরোধ প্রভৃতি। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক ও বাধা-বিপত্তি দূর করে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। অর্থনৈতিক পরিকপনার সাফল্যের জন্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিদেশ থেকে যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা দরকার তা বৈদেশিক বিনিময় মুদরা সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। যদি উপযুক্ত পরিমমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ না থাকে তবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর দেশকে অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হতে হয়। বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা বেশি করে অর্জন করার জন্য প্রধান প্রয়োজন হল রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো, অপ্রয়োজনীয় আমদানির পরিমাণ কমানো এবং যতটা সম্ভব কম খরচে আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করা। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে এগুলি গৃহীত হয়েছে।

৩.৪ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনীতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারত একটি াগ্রণী ভূমিাক নিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশেই ভারতের মতো অর্থ শতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা নেই। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পার সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই আছে। অর্থনীতির পরিকল্পনার মল্যায়নে এক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়ই আলোচনা কতে হবে। আগে সাফল্যের দিকটি বিবেচনা করা যেতে পারে এবং যে যে ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে সেগুলির সঙ্গেও যে ব্যর্থতা জড়িত তা আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের মূল্যায়ন ঃ

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য বিবেচনা করেত গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করা দরকার। —(১) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, (২) কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, (৩) দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস, (৪) অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কিছুটা উন্নতি।*

৩.৪.১ পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

পরিকল্পনাকালে দেশের জাতীয় আয় যথেষ্ট বেড়েছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। ষাটের দশকে বাৎসরিক উন্নয়ন হারের গড় হয়েছিল ৩.৮ শতাংশ। দ্বিতীয় দশক এবং তৃতীয় দশকে এই উন্নয়ন হার ছিল যথাক্রমে ৩.৫ শতাংশ এবং ৩.৪ শতাংশ। অথচ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক অন্ততঃ পাঁচ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রায় তিন দশকে বিশেষ সাফল্য অর্জিত না হলেও আশির দশকে এবং নব্বইয়ের দশকে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আশির দশকে গড় উন্নয়ন হার ছিল ৫.২ শতাংশ। এর মধ্যে সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনারয় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯ শতাংশ। ১৯৯০-৯২ এই দুই বছর জাতীয় আয় সামান্য বাড়লেও (গড়ে ২.৯ শতাংশ) অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৯২-৯৭) গড় উন্নয়ন হার, অর্থাৎ, গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও প্রথম তিন বছরে অর্থাৎ, ১৯৯৭-৯৮ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন হার গড়ে ৬.১৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়নে এটা নিশ্চয়ই সাফল্যে নিদর্শন।

৩.৪.২ পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের মূল্যায়ন

আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী করিকল্পনার গোড়া থেকেই কৃষি উন্নয়নের উপর গুরুত্ব ারোপ করা হয়। ভারতের কৃষি উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল উন্নত ধরনের কৃষি প্রযুক্তির প্রবর্তন এবং সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নয়নের জন্য যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তার বিভিন্ন দিক

---

* ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যার্থতা সম্পর্কে যে সব পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তার উৎসগুলি হল ঃ (1) Different Plan Documents, (2) Reserve Bank of India Bulletin, (3) Prabhat Patnaik—"India's Growth Experience" Economic and Political Weekly, May 1987, (4) V.K.R.V. Rao—India's National Income 1950-58 (Sterling Publisher). (5) Sukhamoy Chakrabart, Develo;pment Planning (Clarendon Press, Oxford, 1987), (6) Economic Survey, Government of India (7) Economic Survey, 1999-2000 (Government of India).

আলোচনা করলে দেখা যায়, ভূমি-সংস্কার, কৃষিক্ষেত্রে নূতন প্রযুক্তি, কৃষি-পণ্য বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন, কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষির যন্ত্রীকরণ এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য অর্থ-সংস্থান—প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদি প্রথম থেকে অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা পর্যন্ত কৃষি উন্নয়ন পর্যালোচনা করা হয় তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথেষ্ট সফল হয়েছে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তার কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, যখন প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করা হয় তখন দেশ খাদ্য-সমস্যায় বিশেষভাবে জর্জরিত ছিল। তখন প্রধান প্রয়োজন ছিল খাদ্যশস্য তথা কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি যাতে কমানো যায় তারও প্রয়োজন তখন অনুভূত হয়েছিল। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টার এটাও একটি কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার পরবর্তী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় যাতে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচমালের যোগান বাড়ে সেজন্য প্রথম পরিকল্পনায় কাঁচামাল উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই কাঁচামালগুলি ছিল কৃষিজাত সামগ্রী। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। পল্লীজীবনের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পও (Community Development Projects) চালু করা হয়েছিল। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভূমি-সংস্কারের নীতি, বিশেষ করে জমিদারি প্রথা ও মধ্যস্বত্বাধিকার বিলোপ করার এবং জমির মালিকানার উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ করার নীতি ঘোষণা হয়েছিল। তবে ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে তখন বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ হয়েছিল খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কৃষিক্ষেত্রকে উপেক্ষা করা হয়নি। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে হয়েছিল ৮১ মিলিয়ন টন। কিন্তু তৈলবীজ, পাট, আখ প্রভৃতির উৎপাদনে আশানুরূপ সাফল্য পরিলক্ষিত হয়নি, তামাকের উৎপাদন কমে গিয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেই নীতিই অনুসৃত হয়েছিল ; কিন্তু কৃষিজাত সামগ্রীর দাম দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া কৃষি-পণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সমবায় খামার (Co-operative Farming) স্থাপনের উদ্যোগও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে নতুনভাবে সাজানো হয়।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হওয়া এবং রপ্তানি চাহিদা মেটাবার মতো কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করা। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির চিত্র ছিল খুবই নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে কৃষির উৎপাদন মোটেই বাড়েনি। যদিও তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বছর খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশাতীত বেড়েছিল (৮৯ মিলিয়ন), তবুও পরিকল্পনার শেষ বছর দেশে খাদ্যসংকট চরমরূপ ধারণ করেছিল। পাট এবং তৈলবীজের উৎপাদনও সামান্যই বেড়েছিল ; আখের উৎপাদন (গুড়) দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে যেখানে ছিল ৩০.২৭ মিলিয়ন টন, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেটা কমে হয়েছিল ২৭.৩৪ মিলিয়ন টন।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পরবর্তী দুই বছর ভারতে খাদ্যসংকট তীব্র হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে কৃষির উৎপাদনও যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে খরা এবং পর্যাপ্ত জলসেচ ব্যবস্থার অভাব ছিল কৃষি-উৎপাদন কমে যাবার প্রধান কারণ। ভারত সরকার তখন বাৎসরিক পরিকল্পনা করে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা পিছিয়ে দিয়েছিল।

ভারতে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের সূচনা হয় চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (Food and Agricultural Organisation) ডিরেক্টর বোরলগ প্রবর্তিত নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে ভারতে ষাটের দশকের গোড়ায় প্রবর্তিত হয়েছিল। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি বা নতুন কৃষি প্রযুক্তি কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হয়। নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী (Intensive Agricultural Development Programme) এবং বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ফলনশীল কর্মসূচী (High Yielding Varieties Programme) নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির যন্ত্রীকরণ, গ্রামাঞ্চলে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করে পাম্পসেটের মাধ্যমে জমিতে জলসেচের সুব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগে জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন (multiple cropping), চারা সংরক্ষণ এবং কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ এবং কৃষকদের উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন এবং সরকারি এজেন্সিগুলি কর্তৃক কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান (inputs) সরবরাহ করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ভরতুকি (subsidy) প্রদান, প্রভৃতি ছিল এই নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং তার ফলে দেশে সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) সূচনা হয়েছিল। খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হলেও এবং খাদ্যশস্যের আমদানি যথেষ্ট কমে গেলেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্যান্য কৃষি সামগ্রীর ক্ষেত্রে, যেমন—আখ, কাঁচা তুলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে, উপাদান বৃদ্ধি আশানুরূপ ছিল না। কাঁচা পাটের উৎপাদন কমে গিয়েছিল।

পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। পঞ্চম পরিকল্পনায় নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বিশেষ করে উত্ত ফলনশীল বীজ রোপণ, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার পরয়োগ, জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা, জমিতে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ প্রভৃতি কর্মসূচী রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ষস্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ উৎপাদন তৈলবীজ উৎপাদন এবং আখের চাষও বেড়ে গিয়েছিল। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সবুজ বিপ্লবের বিস্তৃতি হয়েছিল বটে, তবে সবুজ বিপ্লবের সুফল সমগ্র দেশে সমানভাবে বন্টিত হয়নি। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ভূমি-সংস্কারের গতি ত্বরান্বিত কতা, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নতুন অঞ্চলে সম্প্রসারিত করা এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের এবং কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ ও সেই সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের সুফল দেশে বিস্তৃত এলাকায় সম্প্রসারিত করার কথা বলা হয়েছিল। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় গড়ে বার্ষিক চার শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছিল এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বেড়ে হয়েছিল ১৭৯ মিলিয়ন টন।

অষ্টম এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য অব্যাহত আছে। ১৯১৯-২০০০ সালে, অর্থাৎ নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার তৃতীয় বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ২০৩ মিলিয়ন টন। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ভারত পরায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Near Self-sufficiency) অর্জন করেছে।

পরিকল্পনাকালে কৃষির উন্নয়ন পর্যালোচনায় দেকা যায় শুধু যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তা-ই নয়, কৃষির পরিকাঠামোরও যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। ১৯৬৯ সালে চোদ্দটি ব্যাংক এবং ১৯৮০ সালে ছয়টি ব্যাংক রাষ্ট্রয়াত্ত করা হয়। এই ব্যাংকগুলি এবং সেই সঙ্গে স্টেট ব্যাংক অভ ইন্ডিয়া ও তার সহযোগী ব্যাংকগুলি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলি কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঋণ প্রদান করার নীতি অনুসরণ করেছে। তবে গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে গরীব কৃষকরা কতটা উপকৃত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বর্তমানে পাম্পসেটের সাহায্যে জলসেচের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে; তাছাড়া গভীর নলকূপ স্থাপন করার জন্যও সরকারের আর্থিক বরাদ্দ বেড়েছে। এখনও গ্রামাঞ্চলে বহু জমি জলসেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দেশের গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র এখনও বিদ্যৎ সম্প্রসারিত হয়নি।

ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তবে কোনো কোনো রাজ্যে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে খুবই সামান্য অগ্রগতি হয়েছে; আবার কোনো কোনো রাজ্যে ভূমিসংস্কার আদৌ হয়নি।

৩.৪.৩ পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াসের মূল্যায়ন

ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রকৃত প্রয়াস আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত যে অনেক এগিয়ে আছে এ বিষয়েসন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম উদেনদশ্য ছিল দ্রুত শিল্পোন্নয়ন অর্জন করা। এই উদ্দেশ্যে একদিকে গুরুভার ও মূলধনি শিল্পের উন্নয়নের উপর এবং অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দেশের শিল্পোন্নয়ন যাতে রাষ্ট্র একটি ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য ১৯৫৬ সালে ভারতের শিল্পনীতি (আগে ১৯৪৮ সালে শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছিল) ঘোষিত হয়। এই নীতি অনুযায়ী দেশের ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা হয়।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মৌলিক, মূলধন-সামক্রী শিল্প এবং উৎপাদনক দ্রব্য শিল্প, বিশেষত যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি অর্জিত হয়। সিমেন্ট, কয়লা, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির মতো অত্যাবশ্যক শিল্প দ্রব্যগুলির উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধপত্র, সারে, রাসায়নিক শিল্পেরও ব্যাপক অগ্রগতি হয়। তাছাড়া পাট, সূতিবস্ত্র, চিনি প্রভৃতি শিল্পে আধুনিকীকরণের কা জআরম্ভ হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে সরকারি উদ্যোগে দুগাপুর, ভিলাই ও রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও যথেষ্ট উন্নত হয়।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গুরভার শিল্প এবং মূলধনি সামগ্রী শিল্পের (Heavy industries and capital goods industries) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু বৃহদায়তন ভোগ-সামগ্রী শিল্প (Lare-scale consumption goods industries) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ততটা গুরুত্ব পায়নি। এই অবস্থায় শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উৎপাদন পদ্ধতি মূলধন-নিবিড় (Capital intensive) হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমাদের দেশে মূলধনের যোগান কম ছিল। এজন্য সরকারের অমাদানির উপর নির্ভরতা বেড় গিয়েছিল। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করে দেশের ভিতর দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য শিল্প-উৎপাদনে আমদানি-অনুপাত (import-content) বেশী রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ১৯৫৭ সালে আমদানি লাইসেন্স নীতি শিথিল রা হয়েচিল। কিন্তু বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করার জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, তা ভারতের ছিল না। তার ফলে দেশে তীব্র বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সংকট দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের যে সমস্যা আমরা বরাবর দেখেছি, তার সৃষ্টি হয়

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে। দ্বিতীয় এব তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে এজন্য ভারকে প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

ভারতে শিল্পোন্নয়নের দিতীয় পর্যায়ে আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনরে (import substitution) উপর এবং ভোগ-সামগ্রী শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া বিদেশী প্রযুক্তির সাহায্যও গ্রহণ করা হয়, যদিও তার প্রভাব খুব বিস্তৃত হয়নি।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত শিল্পোৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছিল। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে দেশে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা দেখা যায়।

শিল্পোন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পক্ষেত্রে যে মন্দা সূচিত হয় তা আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতার অন্যতম পরিচায়ক। প্রথম তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদন গড়ে ৭.৭ শতাংশ হারে বেড়েছিল—কিন্তু ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত—এই দশ বছরে শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল গড়ে ৩.৬ শতাংশ হারে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া ১৯৮৬ সালে "Trends in Industrial Production" শীর্ষক যে সমীক্ষা করেছিল, তাতে দেখা যায় ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছিল প্রতি বছর ৫.৮ শতাংশ হারে। রিজার্ভ ব্যাংকের সমীক্ষা অনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার শ্লথ হবার কারণগুলি ছিল—(১) সঠিক উৎপাদনের মাত্রা ও উৎপাদন-কৌশল (inapproirate choice of scale and technology) নিয়োগ না হওয়া, (২) উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের স্বল্পহার (poor rate of capacity utilisation), (৩) উৎপাদন-ক্ষমতা এং চাদিোর মধ্যে সঙ্গতির অভাব (inconsistency between production capacity and demand), (৪) শিল্প-সামগ্রী নির্বাণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা (failure of the manufacturing industry)। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত আমরা যে শিল্প-মন্দা দেখতে পেয়েছি, এটা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম ব্যর্থতা।

পরিলকপনাকালে শিল্পোৎপাদনের গতি শ্লথ হবার স্বল্পকালীন কারণগুলি হল, বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অনুৎপাদনমূলক ব্যবহার, ১৯৬৫ সাল থকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পর পর তিন বছর ধরেখরা ও পরবর্তীকালে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ সালে খরা, এবং এই খরার প্রভাবে কাঁচামালের সরবরাহ হ্রাস, বিদ্যুৎ ঘাটতি, পরিবহনে অব্যবস্থা প্রভৃতিঙগ ১৯৭৩ সালের তেল সংকক্ষ শিল্পক্ষেত্রে কাঠামোগত বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। শিল্প মন্দার দীর্ঘকালীন কারণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য ঃ—(১) শিল্প লাইসেন্সের ক্ষেত্রে জটিল আমরাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ শিল্পক্ষেতের সম্পদের অসম বন্টনের সৃষ্টি করেছিল এবং তার পুঞ্জীভূত প্রভাব শিল্প-উৎপাদনরে ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। (২) ষাটের দশকে কৃষি-উৎপাদন কম হওয়া শিল্পক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কাণণ ছিল। (৩) সরকারি ক্ষেত্রে প্রকৃত বিনিয়োগের (real investment)

পরিমাণ কমে যাওয়া শিল্পোৎপাদন কম হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল। (৪) শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ ক্রমেই বেড়ে যাওয়া, (cost excalation), উৎপাদনী ক্ষমতার প্রকৃত ব্যবহারের অভাব (underutilisation of capacity), মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে অবনতি, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের অভাব এবং ত্রেবিশেষে আর্থিক সংকট—প্রভৃতিও শিল্পোৎপাদন শ্লথ হবার কাণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

পরিকল্পনাকালে আমরা দেখতে পেয়েছি সামগ্রিকভাবে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস এবং সরকারি ক্ষেতেরর সম্প্রসারণ (আশির দশক পর্যন্ত) অব্যাহত থাকলেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়নি। ১৯৯১ সালে দেশের নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হয় এবং এই শিল্পনীতি অনুযায়ী শিপক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ (privatisation) লাইসেন্স প্রথার পরায় বিলোপ (Near abolition of the licensing system) সরকারি উদ্যোগগুলির বিলগ্নীকরণ (Public Disinvestment), রুগ্ন শিল্পগুলিতে বিদায়নীতির (Exit Policy) প্রবর্তন এবং দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য ঢালা ব্যবস্থা ও বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে (Multinational Corporations) ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান,, প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। অর্থনৈতিক উদারীকরণের (Economic Liberlisation) এবং বিশ্বায়নের (Globalisation) নীতি গৃহীত হবার পরিপ্রেক্ষিতেই নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হয় এবং আমদানি নীতিও উদার করা হয়। কিন্তু নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হবার পরও শিল্পোৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ বছর (১৯৯৬-৯৭) শিলোপৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৬ শতাংশ; নবম পাঁচসাা পরিকল্পনার প্রথম দুই বছর শিলোৎপাদন বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক ছিল না। যদিও শিলোপৎপাদন বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়শীল দেশগুলির মধ্যে শিলোপন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত একটি অগ্রণী দেশ, তথ্য-প্রযক্তির (Information Technology) ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে অনেক উন্নত দেশের চেয়েও এগিয়ে আছে।

৩.৪.৪ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মূল্যায়ন

অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে ভারতের প্রধনা সাফল্য হল রেলওয়ে সম্প্রসারণ। বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম রেলওয়ে ব্যবস্থা হল ভারতের কিন্তু সড়ক পরিবহন এবং নদী পরিবহনের ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। তবে সড়ক পরিবহন এবং জল পরিবহন যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত হবার প্রধনা উপাদান হচ্ছে কয়েকটি মূল শিল্প, যেমন—কয়লা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি। তাছাড়া পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধিও গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকালে যথেষ্ট উৎপাদন বেড়েছে। পরিকল্পনাকালে কলকাতার মেট্রো রেল স্থাপও অর্থনৈকি

পরিকাঠামোকে বিশিষ্টতা দান করেছে। দেশের নগর উন্নয় (urban development), স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যায়ৈ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট; নতুন শহর নির্মাণ, আবাসন প্রকল্প, প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবক্ষেত্রে যে সাফল্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়েছে তা নয়। রাস্তাঘাট নির্বাণ, জাতীয় সড়ক আরও উন্নত করা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রয় সরকার কর্তৃক ৫০০০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ একটি পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থ কোম্পানি (Infrastructure Development Finance Company) গঠিত হয়েছিল। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগত বিনিয়োগগারীরা যাতে ভারত মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহী হয় সেজন্য পরিবহণ কাঠামোর উন্নয়ন দরকার—এই উন্নয়নের জন্য অর্থ-সরবরাহকারী হিসেবে এই কোম্পানি গঠিত হয়েছে।

৩.৫ ভারেতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পর যে সব উদ্দেশ্য আগে আলোচিত হয়েছে তার কোনটিই পূরোপুরি অর্জিত হয়নি। বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যর্থতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, যেমন—(ক) দারিদ্র ও বেকার সমস্যা, (খ) বৈদেশিক লেনদেন ব্যাসান্সের সমস্যা ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট, (গ) মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা—প্রভৃতির সমাধান করা এখনও সম্ভব হয়নি; বরং সমস্যাগুলির তীব্রতা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

পরিকল্পনাকালে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ভারতের উন্নয়ন হার হয়েছিল গড়ে ৩.৭৬ শতাংশ, অথচ গড়ে পাঁচ শতাংশ হারে উন্নয়ন হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত দেশে শিল্পক্ষেত্রে আমরা মন্দা দেখতে পেয়েছি। আশির দশকে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি হলেও এখনও দেশ উৎপাদন লক্ষ্য থেকে গিছিয়ে আছে। আয়ের বৈষম্য দেশে বেড়ই চলেছে—সমজাতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের লক্ষ্য থেকেও দেশ এখন অনেক দূরে সরে এসেছে। দারিদ্দর দূরীকরণের সর্মসূচীও সফল হয়নি। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে দেশে ২৫ শতাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে থাকবে বলে ধরা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশি শতাংশ লোক এখন দারিদ্রসীমার নীচে আছে। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে পরিকল্পনা কমিশনের মতে ২৯.১৮ শতাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে ছিল। অপর একটি হিসাবে দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল মোট জনসমষ্টির ৩৫.৯৭ শতাংশ।

পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বাপেক্ষা বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে। এই সমস্যার সমাধানের প্রতি যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত লি, পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অবশ্য দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা পরিকল্পনার অন্যতম

উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা গহীত হয়নি। সংগঠিত শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ কে ম যাওয়ায় কর্মবিনিময় সংস্থার (Employment Exchange) মাধ্যমে চাকুরীর সুযোগও কমে গেছে। গ্রামীণ বেকার সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব হয়নি। একদিকে বেকার সমস্যা, অপরদিকে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসমষ্টির নিদারুণ দারিদ্র্য দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্বিক ব্যর্থতার পরিচায়ক।

আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতার আরেকটি দিক হল মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা। পরিকল্পনাকালে দেশে একশ্রেণীর লোক যথেষ্ট বড়লোক হচ্ছে এবং তারা দেশে কালো টাকার মাধ্যমে একটি সমান্তরাল অর্থনীতির (Parallel economy) সৃষ্টি করেছে। দেশের কালো টাকার সঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়। তবে আনুমানিক এক লক্ষ কোটি কালো টাকা দেশে আছে বলে অনুমিত হয়েছে। ভারত সরকার কঠোর হস্তে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন নি। কালো টাকা মুদ্রাস্ফীতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয় অতিরিক্ত কোষাগার ঘাটতি (Fiscal Deficit) এবং বাজেট ঘাটতির (Budgetary Deficit) মধ্যে। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় রকারের গোষাগার ঘাটতি বা আর্থিক ঘাটতি ছিল দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনরে (GDP) প্রায় ৯ শতাংশের কাছাকাছি। আশির দশকেও এই ঘাটতির তীব্রতা খুব বেশি ছিল। নব্বুইয়ের দশকের শেষে এই ঘাটতির অনুপাত ৫.৬ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ বরাবরই বশি দেখতে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা থেকেই আমাদের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকার অত্যধিক পরিমাণে ঘাটতি অর্থসংস্থানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। যে হারে দেশের উৎপাদন বেড়েছে তার চারগুণ বেশি হারে টাকার যোগান বেড়েছে। তার ফলে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বেড়েই চলেছে, কালো টাকার প্রচলন ও ঘাটতি অর্থসংস্থান ছাড়াও দেশে অত্যাবশ্যক সামগ্রীগুলির ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের অভাব, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পেট্রোল, কয়লা, সিমেন্ট, চিনি, তেল প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি, চোরা কারবার দমনে ব্যর্থতা প্রভৃতিও মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী। খাদ্য সংগ্রহের মূল্যবৃদ্ধি (Rise in Procurement Prices), সরকারি নির্দেশনার ফলে সরকারি বন্টনের আওতায় বিভিন্ন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি (Administered Price hike), ভরতুকির পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং আমদানির মূল্যবৃদ্ধি ঔ (Import Price) মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী। সরকারি উদ্যোগগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমানে লোকসানে চলছে। রকারি উদ্যোগগুলির দক্ষতার অভাব এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিদান হার (rate of return on investment) কম হওয়াও আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরিচায়ক। পরিকল্পনার পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এই জিনিসগুলি প্রতিটি পরিকল্পনাতেই পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। এই সবগুলি কারণই পরিকল্পনাকালে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতার জন্য যায়ী। ভারতে পরিকল্পনার ব্যর্থতা

প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক সুরক্ষা (Social Safety net) বজায় রাখার ক্ষেত্রেও। এখনও দেশের প্রায় ৩৮ শতাংশ জনসমষ্টি নিরক্ষর। শিক্ষার সম্প্রসারণ, শিশু শ্রমের (Child Labour) অবসান, জনস্বাস্থ্য ও ময়লা সাফাইয়ের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ বং আবাসন ব্যবস্থা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কর্মসূচি পুরোপুরি বাস্তাবায়িত হয়নি।

সর্বশেষে, পরিকল্পনার ব্যর্থতা আমরা দেখতে পাই বৈদশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। বছরের পর বছর (১৯৭৬-৭৮ বাদ) বৈদেশিক লেনদেন ব্যাসান্সের চলতি অ্যাকাউন্টে (Current Account of the Balance of Payments) ঘাটতির ফলে সরকারের বৈদেহিক ঋণের বোঝাও বেড়েছে। বৈদেশিক লেনদেন ব্যাসান্সের ঘটতি খুবই তীব্র হয়েছিল ১৯৯১-৯২ সালে। সে বছর বৈদশিক ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনরে ানুপাত Debt_GDP ratio) চিল ৪১.০ শতাংশ। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনাকালে যেসব ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি পরিশোধ করার জন্য বেং সেগুলির উপর সুদ প্রদান করার জন্য n(debt servicing) পরবর্তীকালে আবার ঋণগ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এখাবে দেশ বৈদেশিক ঋণের ফাঁদে (Foreign Debt Trap) আটকে গিয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ ভারতের বৈদেশিক ঋণে পরিমাণ ছিল ৯৭.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এটা ছিল দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনরে ২৩.৫ শতাংশ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ভারতকে প্রচুর ঋণ নিতে হয়েছে।

পরিকল্পনার ব্যর্থতার বোঝা দেশের অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রই দেখা যাচ্ছে। তবে পরিকল্পনার সাফল্যও যে কিছু নেই তা নয়, এবং আমরা আলোচনা করেছি। তবে ব্যর্থতা সর্বাপেক্ষা বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে দারিদ্র্য—দূরকরণের ক্ষেত্রে, বেকার সমস্যার ক্ষেত্রে ও বৈদেশিক ব্যালন্সের ক্ষেত্রে। রপ্তানির চেয়ে আমদানি অনেক বেশি হওয়ায় বৈদেশিক বানিজ্যের ঘাটতি দূর করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩.৬ সারাংশ

ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। ১৯২৪ সালে বারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে ডক্টর বিশ্বশ্বরায়া ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হরিপরা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, তখন সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি সুনিদিলষ্ট কর্মসূচীর রূপরেখা প্রদান করেন। এই সময় ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নানা দিক সম্পর্কে অন্যান্য যাঁরা সুনিদিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর বিশ্বশ্বরায়া, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, শ্রীজওহরলাল নেহরু ও শ্রী ভি.বি. গিরি। তা ছাড়া শ্রী এম. এন. রায় একটি জনগণের পরিকল্পনা (People's Plan) প্রস্তুত

করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠিত হয় তার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন শ্রীজওহরলাল নেহরু। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে যে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় তার পূর্বসূরী হিসাবে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন আমাদের পরিকল্পনার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র গুরুভার শিল্পের উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি, প্রভৃতিকে পরিকল্পনার কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার প্রদান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ ও কুটির শিল্প, বিশেষত খাদি শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে উপর আস্থাবান ছিলেন। অর্থনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ছাড়া বোম্বাইয়ের আটজন শিল্পপতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ; তাকে "বোম্বাই পরিকল্পনা" ("Bombay Plan") বলা হত। তাছাড়া শ্রীমন নারায়ণ (Shriman Narayan) "গান্ধী পরিকল্পনা" ("Gandhian Plan") নামে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। শ্রী. এম. এন. রায় প্রস্তুত করেন "জনগণের পরিকল্পনা" ("People's Plan)। ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাড়া এগুলির বিশেষ কোনো গুরুত্ব বর্তমানে নেই।

স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫০ সালে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) গঠিত হয় এবং ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রস্তুত হবার পূর্বে প্রসিদ্ধ পরিসংখ্যানবিদ্ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ একটি পরিকল্পনা-মডেল প্রস্তুত করেন। এটি মহলানবীশ মডেল (Mahalanobis Model) নামে বিখ্যাত। ভারতে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত ছিল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা ; ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত ছিল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা ; ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত ছিল তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা শেষ হবার পর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি। ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার (১৯৭৪-১৯৭৯) পর আবার একবছরের জন্য একটি পরিকল্পনা (১৯৭৯-৮০) তৈরি করা হয়। ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) এবং সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনার (১৯৮৫-৯০) পর আবার দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২) তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সপ্তম পরিকল্পনা ১৯৯০-৯১ সালের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়া হয়নি। কারণ তখন ছিল তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ভারতে নতুন অর্থনৈতিক নীতি ঘোষিত হয় এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ শুরু হয়। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা ছিল ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে নবম পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা :

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। বর্তমানকালে পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতির পক্ষে জাতীয় আয় দ্রুত বাড়ানো সম্ভব নয়। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ও তার সুষ্ঠু বণ্টন, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ, মূলধন সৃষ্টির হার বাড়ানো, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আয় ও ধনের বৈষম্য কমিয়ে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত সমস্যার মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা, প্রভৃতি উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন খুবই বেশি। নব্বুইয়ের দশকের গোড়ায় অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করার জন্য ভারতে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হয় এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী গৃহীত হয়। ভারত ক্রমশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাচীন কাঠামো থেকে অনেকটা সরে আসে এবং বাজার অর্থনীতির দিকে অর্থনৈতিক নীতি চালিত করতে থাকে। অর্থনৈতিক উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন—এই তিনটি কর্মসূচীর প্রভাবে পরিকল্পনার গুরুত্ব যথেষ্ট কমে যায়। কিন্তু এজন্য পরিকল্পনার যৌক্তিকতা শেষ হয়ে যায়নি। বাজার অর্থনীতিতে যদি যোগান ও চাহিদার মধ্যে কখনও ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় সেখানে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং ভারতে সেটা পরিকল্পিতভাবেই করা যেতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য :

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল—(১) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং তাদের সামনে আরও উন্নত ধরনের এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করা ; (২) জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা (অন্তত বছরে ৫ শতাংশ থেকে ৫.৫ শতাংশে) ; (৩) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি পরিকল্পিত বিনিয়োগের হার অর্জন করা ; (৪) আয় ও ধনের বৈষম্য হ্রাস করা এবং আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীয়করণ হ্রাস করা ; (৫) অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ; এবং (৬) ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যথা—(ক) কৃষি উৎপাদন, (খ) শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষমতা প্রসার এবং (গ) বৈদেশিক লেনদেনের অবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রের সমুদয় প্রতিবন্ধক ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের মূল্যায়ন :

জাতীয় আয় বৃদ্ধি—ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে জাতীয় আয় গড়ে ৩.৬ শতাংশ বেড়েছিল। আশির দশকে গড় উন্নয়ন হার ছিল ৫.২ শতাংশ। অষ্টম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় গড়ে ৬.৭ শতাংশ হারে বেড়েছিল।

ভারতে কৃষি উন্নয়ন—প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনরে উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন আপেক্ষিকভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল, এবং শিল্পোন্নয়নর উপর আপেক্ষিকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ বছর খাদ্য সংকট তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। ভারতে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের সূচনা হয় চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তিত হয়। জমিতে রাসায়নিক সারের উপযুক্ত ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির যন্ত্রীকরণ, উচ্চ ফলনশীল বীজ রোপণ, জমিতে উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা ও কীটনাশক ওষুধের সাহায্যে চারা সংরক্ষণ এবং সরজারি এজেন্সিগুলি গর্তৃক কৃষিটেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় কৃষি-উৎপাদনে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম তিন বছর পর্যন্ত কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত আছে। বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে।

সবুজ বিপ্লবের সূচনা থেকে নবম পরিকল্পনা পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন হলেও ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার অগ্রগতি (পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা বাদে) বিশেষ হয়নি। এখনও দেশের এক তৃতীয়াংশ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। দূর গ্রামাঞ্চলের অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত হয়নি।

শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস ঃ ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য আমদানি নীতি শিথিল করা হয়েছিল যাতে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব হয় ও তার ফলে পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটেরও সৃষ্টি হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগ থেকে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত আমদানি বিকল্পীকরণেরওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিল্পোন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। সত্তরের দশকে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয় বটে; তবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়নি।

আশির দশকের শেষে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। ১৯৯০-৯১ সালের অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং তার অঙ্গ হিসাবে নতুন শিল্পনীতি (১৯১১) ঘোষিত হয়। নতুন শিল্পনীতিতে শিল্পক্ষেত্রে সবসরকারিকরণ, সরকারি উদ্যোগের বিলগ্নীকরণ, রুগ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বিদায় নীতি, লাইসেন্স ব্যবস্থার প্রায় অপসারণ, আমদানি উদারীকরণ (বাণিজ্য নীতির পরিবর্তনের ফলে) এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বহুজাতিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিক ভারতে ব্যবসা করার জন্য আমন্ত্রণ—এগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির

মধ্যে ভারত শিল্পক্ষেত্রে একটি অগ্রণী দেশ হিসাবে পরিচিত। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত অসাধারণ উন্নতি করেছে।

অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নতি—ভারতে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত পরিবর্তনে দেকা যায় তৃতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদন বদ্ধির হার বাড়ছে। এও দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রতিফলিত হয়। কিন্তু দেশের পরিবহন ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখনও আশানুরূপ হয়নি। ১৯৯৬-৯৭ সালে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং পাঁচ হাজার কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ একটি পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থসংস্থা গঠন করা হয়েছে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা ঃ (Failures of Planning in India) : ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন—(ক) বেকার সমস্যা, (খ) বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের সমস্যা ও বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট এবং (গ) মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা। এই সমস্যাগুলির সমাধান করা ভারত সরকারের পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি। বেকার সমস্যার তীব্রতা বেড়েই যাচ্ছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্স এবং লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট চরমে উঠেচিল ১৯০০-৯১ সালে। বৈদেশিক ঋণের সমস্যাও ভারতে তীব্র। মুদ্রাস্ফিতি নিয়ন্তরণে রাখা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে মুদ্রাস্ফিতি বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

দারিদ্র্য হটানোর ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৭-৯৮ সালে জনসমষ্টির ২৯.১৮ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল। অপর একটি হিসাবে দেখা যায় ১৯৯৭-৯৮ সালে দারিদ্র্য অনুপাত ছিল ৩৫.৯৭ শতাংশ। সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে, অর্থাৎ শিক্ষা সম্প্রসারণ, জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা, ময়লা সাফাই, শিশু শ্রমের অবসান, গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ—প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। এখনও দেশের ৩৮ শতাংশ লোক নিরক্ষর।

পরিকল্পার এই ব্যর্থতাগুলি থাকা সত্ত্বেও পঞ্চাশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালিয়ে যাওয়া ভারতের ক্ষেত্রে খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

৩.৭ অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। স্বাধীনতার আগে প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়————————সালে। তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন————এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি ছিলেন————।

২। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা————মডেলের উপর ভিত্তিশীল ছিল।

৩। স্বাধীন ভারতে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হয়————সাল।

৪। ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়————সালে।

৫। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনায় অতীয় আয় বার্ষিক ———— হারে বেড়েছিল।

৬। ————সাল থেকে দেশে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা দেখা যায়।

২। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

১। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের কথা কোন পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রথম বলা হয়েছিল?

২। ভারতে মিশ্র অর্থনীতি গঠনের কথা কখন ঘোসিত হয়েছিল?

৩। নতুন শিল্পনীতি কোন সালে ঘোষিত হয়েছিল?

৪। বাজার অর্থনীতিতেও সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কোথায়?

৫। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্ততঃ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার উল্লেখ করুন।

৬। অর্থনতিক সংস্কারের তিনটি মূল নীতি কি কি?

৭। ভারতে অথনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা কি ছিল?

৮। অর্থনৈকি পরিকল্পনা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরের বাইরে প্রশ্নমালা।

১। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করুন।

২। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। নব্বুইয়ের দশকে পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে দেশ কিছুটা সরে এলেও পরিকল্পনার যৌক্তিকতা কী শেষ হয়ে গেছে?

৩। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করুন এবং বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই উদেশ্যগুলি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছি তা দেখান।

৪। ভারতে পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের মূল্যায়ন করুন।

৫। ভারতে পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াসের মূল্যায়ন করুন।

৬। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশানাস প্ল্যানিং (জয়শ্রী প্রকাশন) কলকাতা।

২। Sukjamoy Chakrabarty : Development Planning (1987).

৩। Pramit Chaowdhury (ed.) : Aspects of Indian Economic Development (1971).

৪। Prabhat Patnaid : "Indian's Growth Experience", Economic and Political Weekly, May 1987.

৫। সুব্রত গুপ্ত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (2000).

৬। A. Vidyanathan, "The Indian Economy Since Independence (1947-1970); Dharma Kumar (ed.), The Cambridge Economic History of Indai : Vol. II (1983).

৭। Montek Allutialia, "Economic Performance of States in Post-Reforms Period", Economic and Political Weekly, May 6–12, 2000.

৮। Bipan Chandra/ Mirdula Mukherjee, Aditya Mukherjee, India After Independence (1999).

একক ৪ ❐ নেহেরুর পররাষ্ট্রনীতি—জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির পরিস্থিতি—ঠাণ্ডা যুদ্ধ **(Cold War)** এবং তৃতীয় বিশ্বের **(Third World)** উত্থান।

৪.৪ তৃতীয় বিশ্ব সহযেগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ তত্ত্ব—সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য।

৪.৫ নেহরুর নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বসহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম।

৪.৬ নেহেরুর নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (১৯৬১-১৯৬৪)—পরবর্তী পর্যায়—বর্তমান সময়।

৪.৭ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল্যায়ন।

৪.৮ উত্তর—ঠাণ্ডা যুদ্ধ **(Post-Cold War)** প্রভাবিত বিশ্বরাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

৪.৯ সারাংশ

৪.১০ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির প্রধান উদ্দেশ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি গঠন এবং নির্মাণ পরিক্রয়ার সঙ্গে আপনাদের পরাথমিক পরিচয় করানো। স্বাধীন ভারতের প্রথম দুই দশকে পররাষ্টরনীতির প্রধান রূপকার ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৯৪৭-১৯৬৪)। দিবতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতিতে মেরুকরণ (Polarisation) প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে, নেহরু ভারতের নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতার একটি ধারা গড়ে তোলেন যা শেষ পর্যন্ত জন্ম দেয় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের। এই এককটিতে আপনারা দেখবেন—

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরানীতির প্রেক্ষাপট—ঠারডা যুদ্ধ এবং তৃতীয় বিশ্বের উত্থান।
- জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন—সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য।
- তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পেছনে নেহরুর ভূমিকা।
- ভারতের নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অগ্রগতি ও বিস্তার।
- জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল্যায়ন।
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বর্তমান সময় প্রাসঙ্গিকতা।

৪.১ প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ের অন্য এককগুলি পড়ে আপনারা জেনেছেন যে কিভাবে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম দুই দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সাংবিধানিক এবং অর্থনৈতিক—নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে ভারত একটি বিকাশশীল, জনকল্যামুখী রাষ্ট্রে (Welfare State) রূপান্তরিত হয়েছিল। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হল পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণ। স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান রূপকার ছিলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু (১৯৪৭-১৯৬৪)। তাই, স্বাধীনতার পরবর্তী দুই দশকে ভারতের বিবর্তিত পররাষ্ট্র নীতিকে ''নেহেরুনীতি'' বলা যুক্তিসংগত।

'নেহেরুনীতির' অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতার কাঠামো গড়ে তোলা এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধ প্রভাবিত বিশ্ব মেরুকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে ভারতকে রাখা। এই লক্ষ্যে নেহরু সফল হন। তাঁর নীতি, ভারতকে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির নেতৃত্ব এনে দেয়, এবং ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান রূপকার হয়ে ওঠে।

এক এককটিতে আপনার দেখবেন যে দ্বিতীয় বিশ্ব পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট কিভাবে একদিকে ঠাণ্ডাযুদ্ধ এবং অপরদিকে তৃতীয় বিশ্বের উত্থান দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে এবং, সদ্য স্বাধীন ভারতের কর্ণধার হিসেবে কেন নেহেরু ভারতকে মেরুকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে, তৃতীয় বিশ্ব জোট গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়া, াপনার দেখবেন যে নেহরু কিভাবে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে একদিকে ভারতের সুরক্ষা নীতি, এবং অপরদিকে ভারতের নেতৃত্বে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করাবার প্রয়োজনে ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সবশেষে, আপনারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাফল্য এবং ব্যর্থতার একটি মূল্যায়ন দেখবেন এবং জানতে পারবেন যে বর্তমান সময়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি।

৪.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির পরিস্থিতি—ঠাণ্ডাযুদ্ধ এবং তৃতীয় বিশ্বের উত্থান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই জয়ী মিত্রপক্ষের মধ্যে ভাঙন লক্ষ্য করা যায়ঙ্গ যা বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে এক মেরুকরণ (Polarisation) প্রক্রিয়া নিয়ে আসে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি (প্রধানত গ্রেট ব্রিটেন) দীর্ঘমেয়াদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার ফলে সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এর ফলে বিশ্বরাজনীতির একদা প্রধান বৈশিষ্ট্য 'ইউরোপ-কেন্দ্রিকতার' (Euro-Centrism) অবসান ঘটে। ধনতান্ত্রিক, পশ্চিমী গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অবিংসবাদিত নেতা হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি।

এর বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজের প্রভাব বাড়াতে সক্ষম হয়। প্রথমে ইউরোপে, পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বে, একে অপরের প্রভাব খর্ব করা এবং নিজের প্রভাব বিস্তার করার প্রচেষ্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সেভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্বের সূচনা করে। বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে যাকে বলা হয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ (Cold War)।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ, বিশ্বরাজনীতিতে এক মেরুকরণ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আমেরিকার নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক, পশ্চিমী গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি যে জোট গঠন করে তাকে বা হয় প্রথম বিশ্ব (First World)। অপরদিকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হয় সমাজবাদপন্থী দেশগুলির সংগঠন, যাকে বলা হয়, দ্বিতীয় বিশ্ব (Second World)। মাঝে মাঝে, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, দ্বন্দ্ব লাঘব করবার প্রচেষ্টা হলেও, ঠাণ্ডা যুদ্ধের ইতিহাস, মূলত, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাসে দ্বন্দ্ব, পরো লড়াই, সামরিক প্রতিযোগিতা এবং গুপ্তচর বৃত্তির ইতিহাস, যা বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টাকে প্রবলভাবে ব্যাহত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, ইউরোপীয় দেশগুলির দৈন্যদশার ফলে, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করে। এর প্রতিফলন ঘটে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমরেিকা মহাদেশভুক্ত উপনিবেশগুলিতে। এটি যদিও একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকিরয়া, তবু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে, এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে। একটি হিসেব অনুযায়ী ১৯৪৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বিশ্বের মানচিত্রে ৬৬টি দেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে; এদের মধ্যে অধিকাংশই এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত।

এই নতুন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নানা প্রকারের বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য থাকলেও, এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল

অর্থনৈতিক দুর্বলতা। উপনিবেশ হিসেবে এই দেশগুলির অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল (Raw materials) জোগানদারের ভূমিকায় কাজ করেছে এবং পশ্চিমী শিল্প দ্রব্যের বৃহৎ বাজার হিসেবে কাজ করেছে। এর ফলে ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সেরকম সুদৃঢ় হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করলেও, তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। এইসব দেশগুলি তাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী দেশগুলির ওপর আরো নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এছাড়া, তারা নতুন গড়ে ওঠা বিশ্ব সংগঠনগুলি যেমন, আন্তর্জাতিক অর্থ ভারডার (International Monetary Fund I.M.F.) এবং বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) (যেগুলির ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ ছিল অবিসংবাদিত)-এর ওপরও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। নতুন রাষ্ট্রগুলির ওপর প্রথম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ প্রকিরয়া বর্ধিত হয় প্রধানত অর্থনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে। বিভিন্ন প্রকল্প যেমন, ঋণদান, অনুদান, শিল্পদ্রব্য জোগান ইত্যাদির মাধ্যমে, ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী গোষ্ঠীর আধিপত্য তাই এই রাষ্ট্রগুলির ওপর বজায় থাকে, এবং বর্ধিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অভিহিত করা হয় 'নব্য উপনিবেশবাদ' নামে (Neo-colonialism)। ঠাণ্ডা যুদ্ধের পটভূমিকায় এই নব্য উপনিবেশবাদ আলাদা মাত্রা লাভ করে কারণ, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব উভয়েরই লক্ষ্য হয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা। প্রথম বিশ্বের অনুকরণে সোভিয়েট ইউনিয়নও পূর্ব ইউরোপে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে।

এই বিশ্বব্যাপী মেরুকরণের বিপটে এই নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি হয় যার ফলে তারা কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হতে অস্বীকার করে। এই চেতনা থেকেই জন্ম নেয় 'তৃতীয় বিশ্বের' ধারণা। এই চেতনা গঠনের ক্ষেত্রে নেহরুর ভূমিকা অপরিসীম। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ১। তৃতীয় বিশ্ব বলতে কি বোঝেন?

প্রশ্ন ২। 'নব্য-উপনিবেশবাদ' মানে কি?

৪.৪ তৃতীয় বিশ্বসহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন—সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য

তৃতীয় বিশ্ব গঠনের পেছনে নেহেরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারত তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির নেতৃত্ব লাভ করে। আবার, নেহরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের নেতৃত্বে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশীদার হয়।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত, দুর্বল তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের মেরুকরণ প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার দ্বারা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া। অধ্যাপক আপ্পাদোরাই (A. Appadorai), তাঁর ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট এন্ড ইন্ডিয়াস ফরেন পলিসি (National Interest and India's Foreign Policy) গ্রন্থে, জোট নিরপেক্ষ তত্ত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা লিখেছেন —

১। কোনো দেশের সঙ্গে সামরিক চুক্তির বা কোন সামরিক গোষ্ঠীর সদস্য না হওয়া। মূলত, এর প্রধান লক্ষ্য ছিল জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তত্ত্বাবধানে গঠিত উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন (North Atlantic Treaty Organisation অথবা NATO) এবং, সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত ওয়ারশ চুক্তি সংগঠনের (Warshaw Pact) বাইরে রাখা। এই প্রধান দুই সামরিক সংগঠন ছাড়া, জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি অন্যান্য সামরিক সংগঠনগুলিরও (উদাহরণ SEATO, বা CENTO) বিরুদ্ধে ছিল।

২। জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখা। কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে, নির্দিষ্ট এবং বিশ্বশক্তি নির্দেশিত নীতি অনুধাবন করা হত না।

৩। শুধুমাত্র নিজস্ব গোষ্ঠীতে আবদ্ধ না থেকে বিশ্বের সব দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক এবং সহযোগিতা বজায় রাখা।

জোটনিরপেক্ষ তত্ত্ব সম্বন্ধে এটাও মনে রাখা দরকার যে এটি কখনই একটি স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist), নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নয়। নিরপেক্ষতা শুধুমাত্র সামরিক চুক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। অন্যান্য বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান রূপকার নেহরু ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায়, এই প্রসঙ্গে ৩ ও ৯ ডিসেম্বর ১৯৫৮ সালে, একটি ভাষণে বলেন, "....আমরা যখন বলি যে আমাদের নীতি হল জোটনিরপেক্ষতা, আমরা নিশ্চিতভাবে সামরিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই জোটনিরপেক্ষতার কথা বলি। এটি কোন নেতিবাচক নীতি নয়, বরং ইতিবাচক এবং স্পষ্ট নীতি, এবং আমার বিশ্বাস, এটি একটি গতিশীল নীতি।" ("When we say our ploicy is one of non alignment, obviously me mean non alignment with military blocks. It is not a negative policy. It is positive one, a definite one and I hope, a dynamic one." *(Source: A. Appadorai. National Interest and India's Foreign Policy)*। পুনরায়, ২২ নভেম্বর ১৯৬০ সালে আরেকটি ভাষণে, নেহরু বলেন, "আমি আগেও বারংবার বলেছি যে ভারতের ক্ষেত্রে 'নিরপেক্ষ' কথাটির ব্যবহার আমি পছন্দ করি না। এমনকি, কয়েকটি দেশের দ্বারা ভারতের নীতিকে 'ইতিবাচক নিরপেক্ষতা' বলে মন্তব্য করাটাও আমি পছন্দ করি না, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহভাবে আমরা জোটনিরপেক্ষ, আমরা কোন সামরিক জোটের প্রতি পক্ষপাতী নই। কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আমরা বিভিন্ন নীতি, ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং আদর্শের প্রতি পক্ষপাতী..." ("As I have said repeatedly, I do not like the word "neutral" as being applied to India. I do not even

like India's policy being referred to as 'positive neutrality' as is done in some countries. Without doubt, we are unaligned: we are uncommitted to military blocks; but the important fact is that we are committed to various policies, various urges, various objectives, ad various principles....." (Source : Appadorai).

এই লক্ষ্যে নেহরুর নেতৃত্বে ভারত কমনওলেথ্ (Commonwealth) গোষ্ঠীর সদস্য হয়। ভারতের নেতৃত্বে গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘে নিজেদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া পেশের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করে। তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতার পূর্ণ রূপায়ণ ঘটে নির্জোট আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে।

প্রশ্ন ১। 'জোটনিরপেক্ষ' এবং 'নিরপেক্ষ'র মধ্যে পার্থক্য কি?

৪.৫ নেহরুর নেতৃত্বে বিশ্ব সহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম

পিটার ক্যালভোকোরেসী (Peter Calvocoressi) তাঁর ওয়ার্লড পলিটিকস সিন্ন ১৯৪৫ (World Politics since 1945) গ্রন্থে লিখেছেন যে তৃতীয় বিশ্বের সহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান রূপকার এবং কর্ণধার ছিলেন নেহরু যাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ এই তৃতীয় গোষ্ঠীর অন্যতম রূপকার হয়ে ওঠে।

তৃতীয় বিশ্বসহযোগিতা এবং বিশ্বশান্তির প্রবক্তা হিসেবে নেহরুর আত্মপ্রকাশ ভারতের স্বাধীনতার পূর্বেই লক্ষ্যণীয়। ১৯২০ দশকে নেহরু জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। ১৯২৭ সালে নেহেরু ইউরোপে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্ঠিত 'উপনিবেহবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। মূলত তাঁর প্রভাবে জাতীয় কংগ্রেসে একটি বিদেশ দপ্তর খোলা হয়। ১৯৩০-এর দকে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস বারংবার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাসী বাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেছিল। নেহরু আন্তর্জাতিক সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ইথিওপিয়া, স্পেন, চীন, চেকোস্লাভিকিয়া বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। স্বাধীনতার পূর্বেই নেহরুর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাম্রাজ্যবাদ এবং সামরিক নীতি পরিপন্থী চিন্তাধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'তৃতীয় বিশ্বসহযোগিতা' তত্ত্বের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে, যখন নেহেরুর তত্ত্বধানে নতুন দিল্লীতে একটি এশিয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৮টি সদস্যদেশ অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে কেবল একজন স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি ছিলেন। এই সম্মেলনে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় যেমন, ভূমিসংস্কার, শিল্পায়ন, এশীয় সমাজবাদ, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি এবং রাষ্ট্রসংঘে এশীয় দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব

বাড়ানো। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে পুনরায় নতুন দিল্লীতে একটি এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে। নেহেরুর প্রচেষ্টাতে প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত করা সম্ভব হয়। ভারত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও, কমনওয়েলথ্ সদস্য হয় মূলত পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে।

১৯৫০-এর দশকে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বমেরুকরণ প্রক্রিয়া আরো সুদৃঢ় হয়। ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রভাব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। থাইল্যাণ্ড এবং ফিলিপিনস্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সাক্ষরিত করে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত দুটি সামরিক সংগঠন, সাউথ ইস্ট এশিয়ান ট্রিটী অরগানাইজেসন (South-east Asian Treaty organisation—SEATO) এবং সেন্ট্রাল ট্রিটী অরগানাইজেসান (Central Treaty organisation—CENTO)-এর সদস্য পদ গ্রহণ করে। অপরদিকে, সোভিয়েট ইউনিয়ন আফগানিস্থানের সঙ্গে একটি চুক্তি সাক্ষরিত করে। এই পরিস্থিতিতেও ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি, এবং সামরিক গোষ্ঠীর বাইরে থাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৯৫৫ সালে ভারত এবং চীনের মধ্যে পঞ্চশীল চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এছাড়া, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া, উভয়েরই সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরিত করে।

এই দশকের মেরুকরণ প্রক্রিয়া এবং এশিয়ায় তার বিস্তার নেহেরু এবং সমভাবাপন্ন তৃতীয় গোষ্ঠীর নেতাদের বিচলিত করে তোলে, এবং তারা তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বানদুং শহরে একটি আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বানদুং সম্মেলনে ২৯টি সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৬ জন আফ্রিকা দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন। নেহরু ছাড়া এই সম্মেলনের অপর গুরুত্বপূর্ণ নেতারা হলেন ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ এবং মিশরের নাসের। প্রধানত নেহরুর আমন্ত্রণে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই বানদুং সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বানদুং সম্মেলনে বিভিন্ন ঘোষণা করা হয়, যার মধ্যে প্রধানগুলি হল—

১। মানবসভ্যতা রক্ষা করার জন্য বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ এবং আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ।

২। বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা।

৩। নিরস্ত্রীকরণ এবং আনবিক অস্ত্র পরিহারের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা। এছাড়া, তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, রাষ্ট্রসংঘে একত্রে কাজ করার অঙ্গীকারও করে।

বানদুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কিছু পরেই, ১৯৫৬ সালে নেহরু এবং নাসের, যুগোস্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটোর সঙ্গে ব্রিয়োনীতে (Brioni) সাক্ষাৎ করেন। যুগোস্লাভিয়া, এই সময় থেকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের

প্রভাব কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশীদার হয় এবং প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে, ১৯৬১ সালে।

প্রশ্ন ১। নেহরুর 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' কিভাবে ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে গঠিত হয়?

প্রশ্ন ২। তৃতীয় গোভষ্ঠীর সহযোগিতা কিভাবে প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার (১৯৬১) আগে পর্যন্ত বিবর্তিত হয়েছিল?

৪.৬ নেহরুর নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (১৯৬১-৬৪) পরবর্তী পর্যায়

বেলগ্রেডের প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নেহেরু, টিটো, নাসের এবং সুকর্ণ। সম্মেলনের উন্নয়নশীল দেশগুলির সুবিধার্থে নব্য উপনিবেশবাদ এবং মেরুকরণের বিরুদ্ধে একটি ঘোষণা পত্র জারী করা হয়। এছাড়া, তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন বিশ্বরাজনীতির এক সংকটজনক পরিস্থতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাহারা অঞ্চলে ফরাসি আণবিক বিস্ফোরণ, আফ্রিকায়, তিউনিসিয়া এবং কংগোতে ক্রবর্দ্ধমান সংঘাত, সোভিয়েট রাশিয়ার পারমানবিক বিষ্ফোরণ এবং, কিউবাকে কেন্দ্র করে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে প্রায় যুদ্ধাকলীন পরিস্থিতি—এই সব বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধিা পায় এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আরো গভীরভাবে অনুভূত হয়। ওই পরিপ্রেক্ষিতে, সম্মেলনের পক্ষ থেকে দুই বিশ্বশক্তির উদ্দেশ্যে একটি ঘোষণা পত্র জারী করা হয়। এতে, আনবিক যুদ্ধের ভৱাবহতার সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী জাতরী করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, উভয়কেই অবিলম্বে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের দ্বকন্দ্ব মিটিয়ে নেবারঅনুরোধ জানানো হয়।

দ্বিতীয় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কায়রোতে (মিশর) ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই নেহরুর মৃত্যু হয় (১৯৬৪)। কিন্তু ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। কায়রো সম্মেলনে, 'শান্তি এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার একটি পরিকল্পনা নামক একটি ঘোষণা গৃহীত হয় যাতে বিশ্বশান্তি, আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং শান্তির মাধ্যমে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মেটানোর প্রস্তাব করা হয়।

তৃতীয় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় লুসাকায়, চতুর্থ, আলজিয়ার্স এবং পঞ্চম কলম্বোয়। ষষ্ঠ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় হাভানায়। সপ্তম সম্মেলন নতুন দিল্লীতে ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়, যেটি ছিল ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলন।

এ পর্যন্ত (২০০০ সাল) বারোটি জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত সদস্য দেশের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো পনেরয় (১১৫)।

প্রশ্ন ১। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম তিন উদ্যোক্তা করা ছিলেন?

২। প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৪.৭ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল্যায়ন

এই অংশে, মূলত নেহরুর আমলে (১৯৬৪) জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ধারা নিয়ে আলোচনা করা হল। 'জোটনিরপেক্ষ' সংজ্ঞাটির মধ্যে একটি আদর্শের প্রশ্নও অন্তর্নিহিত ছিল। নেহরু তার বিভিন্ন ভাষণে 'জোট-নিরপেক্ষ' আন্দোলনকে একটি আদর্শের স্তরে উত্তীর্ণ করেচিনে; নেহরুর মতে, জোট নিরপেক্ষতা, কোন সুযোগন্ধানী, বিদেশনীতি নয়। আধুনিক অনেক গবেষকরা কিন্দু নেহরু প্রবর্তিত জোটনিরপেক্ষ নীতিকে মূলত তাঁর বিদেশনীতির অঙ্গ হিসবে দেখেন। তাই, এই অংশে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল্যায়ন নেহরুর বিদেশনীতির অঙ্গ হিসাবেই করা হল।

কোন পররাষ্ট্র নীতি বা বিদেশ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বেং, বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা। নেহরু, মূলত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মাধ্যমে, ভারতকে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এটি তার এক প্রধান কৃতিত্ব। দ্বিতীয়ীত, জোটনিরপেক্ষ অবস্থানের ফলে, ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়েরই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। এছাড়া, চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল মৈত্রীচুক্তির দ্বারা ভারতের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, যিদও সীমান্ত এলাকা নিরূপণ এবং তিব্বতের ওপর চীনের অধিকারকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কের অবনিতি ঘটে, যার চূড়ান্ত পরিণাম, ১৯৬২ সালের যুদ্ধ।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাফল্যের এবং যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেক গবেষকরাই সন্দিহান। কিছু মহলে এমন অভিযোগ করা হয়েছিল যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, পশ্চিমী গোষ্ঠগুলির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রতিবেশী সহানুভূতিশীল ইচল। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে নেহরু ১৯৫৬ সালের সুয়েজখাল সংকট নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলির হস্তক্ষেপের সমালোচনা করলেও, একই সময়ে রাশিয়ার ফৌজ দ্বারা হাঙ্গেরীর গণ অভ্যুত্থান দমন করার সময় নেহেরু কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। আবার, ইথিওপিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়ে, বিপ্লবী এরিট্রীয় (Eritreans) পক্ষ, সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইথিওপিয়া, জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য হলেও, এই গোষ্ঠী সেভাবে কোন সাহায্য করতে অসমর্থ হয়। ভারত

নিজেও, ১৯৭১ সালে, সেভিয়েট ইউনিয়নের সাথে এক চুক্তি সাক্ষরিত করে। এছাড়া, সত্তরের দশকে, জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, এদের মধ্যে অধিকাংশই প্রথম ও দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। সবশেষে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সামলোচকদের মতে, ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে, সোভিয়েট পতন এবং বেঙে যাবার পর, বিশ্বরাজনীতিতে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন তার সমস্ত প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলা অবশ্য যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমত, পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে এটি ভারতীয় জাতীয় স্বার্থকে (National Interest) সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারত, আমরা আগেই দেখেছি, কিভাবে দুই বিশ্বশক্তির সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৬২ সালে চীন ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক চুক্তি না থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন, উভয়েই ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সেভিয়েট ইউনিয়ন প্রথমদিকে ভারতের জোট বহির্ভুত নীতির প্রতি সন্দিহান হলেও, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর (১৯৫৩), জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক হয়ে ওঠে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, নেহরুর আমলে একদা উপনিবেশগুলি, যেমন ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরী, নাহে এবং পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন, দিউ, ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গোয়ার ক্ষেত্রে নেহরু সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেন। জোটনিরপেক্ষ নীতির ফলেই এই ক্ষেত্তরগুলিতে বিশ্বশক্তির হস্তপেক্ষ ঘটেনি।

বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকাতেও তৃতীয় গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে নেহেরু সম্পূর্ণ অসফল ছিলেন না। ঠাণ্ডা যুদ্ধের বিস্তার রোধ করার লক্ষ্যেও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কিছুটা সাফল্যলাভ করে। পিটার ক্যালভোকোরেসী, তাঁর ওয়ার্লড পরিটিক্স সিন্স ১৯৪৫ গ্রন্থে লিখেছেন যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তিনভাবে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের বিস্তার রোধ করে। প্রথমত, নিজেরা কোন গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ না করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের গতিরোধ করে। দ্বিতীয়ত, একজোট হয়ে দুই বিশ্বশক্তিকে বাধ্য করেতাদের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং, তৃতীয়ত, রাষ্ট্রসংঘে এবং জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বারংবার নিজেদের মতবাদ তুলে ধরে বিশ্বের প্রতিটি দেশকে তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করে।

এছাড়া, তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতা এবগং সহমর্মিতা তেকেই জন্ম নেয় 'নব আন্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর' (New International Economic order) ধারণা। তৃতীয় বিশ্বর উন্নয়নশীল দেশগুলি, ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে তাদের নতুন অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে যে আন্দোলন চালায়, তার আরম্ভ, নেহরুর আমলের তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতার ধারণঅ থেকেই উদ্ভুত হয়।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্যের নজির রেখেছে।

প্রশ্ন ১। 'জোটনিরপেক্ষ' তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা আপনি কি যথার্থ বলে মনে করেন?

৪.৮ ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম নিদর্শন হল ঠামরডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা। আপনারা আগেই দেখেছেন যে জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। (অধুনা-১১৫)। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই সদস্য (অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র তুর্কমেনিস্থান এবং উজবেকিস্থান এখন এই গোষ্ঠীর সদস্য। সম্প্রতি, বেলোরুশ এবং ডমিনিক প্রজাতন্ত্রও সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। ভানান্য সোভিয়েট ইউনিয়নের অংশীদারদের মধ্যে, আর্মেনিয়া, আরেজবাইজান, গিরগিজস্থান, ইউক্রেন এবং রাশিয়া, চেকপ্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া, স্লোভানিয়া, বরগেরিয়া, স্লোভাকিয়া এবং বসনিয়া হার্জেগোভিনা যথাক্রমে পর্যবেক্ষকের পদ এবং অতিথি রাষ্ট্রের পদ গ্রহণ করেছে।

অপরদিকে পশ্চিমী গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কানাডা, জার্মানী, গ্রীস, ইটালি, নেদারল্যারডস, নরওয়ে, পতুগাল, স্পেন, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ড, অতিথি রাষ্ট্রের পতে অভিষিক্ত। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রদের মধ্যে ব্রেজিল এব মেক্সিকো, পর্যবেক্ষকের পদে আসীন।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই তার বিশ্ব সহযোগিতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনও বর্তমান অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের (globalisation) পটভূমিকার, আরো তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, যার প্রমাণ, স্থানীয় ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার স্তির লাভ (REgional Economic Co-operation)। এছাড়া, বিশ্বব্যাপী আণবিক অস্ত্র বিরোপ, নতুন অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গঠন, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, অধুনা দক্ষিণ (South) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজ করে চলেছে।

প্রশ্ন ১। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কিভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে?

৪.৯ সারাংশ

স্বাধীন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণে প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর গুরুত্ব অপরিসীম। এই পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল, জোটনিরপেক্ষ নীতি, যাতে ভারত, প্রথম বা দ্বিতীয় কোন গোষ্ঠীরই সদস্য হতে অস্বীকার করে। এই পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, বিশ্ব রাজনীতির এক জটিল পটভূমিকায়, যখন একদিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতার ফলে এক মেরুকরণ প্রক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। অপরদিকে, প্রাক্তন ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি 'তৃতীয় বিশ্ব' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের ফলে ভারত এই তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির নেতৃত্ব লাভ করে। জোট নিরপেক্ষ নীতি অবশ্য কোন নেতিবাচক নিরপেক্ষ নীতি ছিল না। শুধুমাত্র সামরিক জোটের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতা বজায় ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

নেহরুর নেতৃত্বে 'তৃতীয় বিশ্ব' সহযোগিতার প্রসার ১৯৪৭-এর পূর্বেই লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ বং ১৯৪৯ সালে এশীয় সম্মেলনে এবং ১৯৫৫ সালের ব্যনদুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই জোট আরো সংঘবদ্ধ হয়। এবং, ১৯৬১ সালে প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রগতি অব্যাহত থাকে, নেহরুর মৃত্যুর পরও। অধুনা, ১১৫টি দেশ এই গোষ্ঠীর সদস্য। কিছু ক্ষেত্রে অসফল হলেও, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রভাব কিছুটা সীমিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া, রাষ্ট্রসংঘে এবং নতুন অর্থনীতি গঠনের দাবিতে জোটনিরপেক্ষ আনোদলন বিশ্ব রাজীনতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে নতুন দেশগুলির এই গোষ্ঠীতে যোগদান এবং অপরদিকে 'দক্ষিণ' (South) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার কাজ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করেছে।

৪.১০ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন ১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতির পটভূমিকা কেমন ছিল?

প্রশ্ন ২। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গঠনে নেহরুর ভূমিকা কি ছিল?

প্রশ্ন ৩। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রসাঙ্গিকতা কতখানি?

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, India After Independence (1999).
২। V. P. Dutt, India and the World (1990).
৩। V. P. Dutt, India's Foreign Policy (1984).
৪। S. Gopal, Jawaharlal Nejru : A Biography, Vols. 2 and 3 (1979 and 1984).
৫। B. R. Nanda (ed.) Indian Foreign Policy : The Nehru Years (976).
৬। B. N. Pande (ed.) A Centenary History of the Indian National Congress, Vol. IV (1990).
৭। J. Bandyopadhaya, The Making of Indian Foreign Policy (1979).
৮। A. Appadorai and M. S. Rajan, Indias Foreign Policy and Relations (1985).